ছাত্ররাজনীতি : আদর্শহীনতাকে আদর্শ মনে করার বিকার

১৫ অক্টোবর ২০১৯ ০০:০০
আপডেট: ১৫ অক্টোবর ২০১৯ ০০:৩৬

বুয়েটের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যাকা- ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠার পর ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবি উঠেছে সাধারণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কাছ থেকে। অনেক শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীও এই দাবি সমর্থন করছেন। ইতোমধ্যে বুয়েট কর্তৃপক্ষ সেখানে সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকা- নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

অনেকের মত হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্ররাজনীতি মোটেও ভালো কিছু দিচ্ছে না। নৃশংসতা, বর্বরতা, হানাহানি চলছে। অসুস্থ ছাত্ররাজনীতি শিক্ষাঙ্গনকে গ্রাস করে ফেলেছে। ছাত্ররাজনীতির নামে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ নানা অপকর্ম হচ্ছে। ভিন্নমতের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় মুক্তচিন্তার চর্চা হওয়ার কথা থাকলেও সেখানে রাজনীতির নামে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে। এ অবস্থা দেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয় ও বড় কলেজগুলোয়। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা পরিণত হয়েছেন প্রতিপক্ষ দমনের পেটোয়া বাহিনীতে। শুধু প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরাই নন, সাধারণ শিক্ষার্থীরাও তাদের প্রতিহিংসার শিকার হচ্ছেন।

advertisement

কেউ কেউ এমনও বলছেন যে, বিদ্যমান ব্যবস্থায় ছাত্ররাজনীতি সংশোধনের তেমন সুযোগ নেই। কেননা বর্তমানে দেশের রাজনীতিতে যে ধারা চলছে, তাতে ছাত্র সংগঠনগুলোকে মূল দলের অনুগত হতে হয়। এই ধারার ছাত্ররাজনীতিতে অব্যবস্থাপনা, দুর্বৃত্তায়ন, টেন্ডারবাজি, ক্ষমতাকে উপভোগ করার সব বিষয় চলে আসে। ক্ষমতা প্রদর্শন ছাত্ররাজনীতিকে নষ্ট করে দিয়েছে। এই ছাত্ররাজনীতিতে জনসেবার আদর্শ নেই। ক্ষমতার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে শিক্ষকরাও দলবাজিতে মত্ত হয়ে পড়ছেন। তাদের মধ্যে শিক্ষকসুলভ আচরণের ঘাটতি লক্ষ করা যাচ্ছে। তারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করছেন। ছাত্ররাও সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের লাভের আশায় কাজগুলো করছেন। এ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গসংগঠন হিসেবে ছাত্র ও শিক্ষকদের রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়ার মধ্যেই অনেকে শিক্ষাঙ্গনগুলোর ভবিষ্যৎ দেখছেন।

আবার অনেকে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের বিপক্ষেও নানা যুক্তি তুলে ধরছেন। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সরকার ছাত্ররাজনীতি বন্ধের পক্ষে নয়। মাথাব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলা কোনো সমাধান নয়।

এ কথা ঠিক ছাত্ররাজনীতির নামে বর্তমানে যা চলছে, তা সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু এটা ছাত্ররাজনীতির সমস্যা নয়। এটাকে বরং জাতীয় রাজনীতির সমস্যা বলা চলে। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্র সংগঠনগুলোকে স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। অছাত্র, অনিয়মিত ছাত্রদের নেতৃত্বে বসায়। তাদের কার্যকলাপের কখনো তদারকি করে না। সংগঠনের নামে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, খুন, সন্ত্রাস, ভিন্ন দল ও মতের ওপর অত্যাচারসহ নানা অপকর্ম করার পরও কারও শাস্তি হয় না। মুক্তচিন্তা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, ছাত্রসমাজের সমস্যা সমাধানের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার পরিবর্তে ছাত্র সংগঠনগুলো সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পারস্পরিক হানাহানি-মারামারিতে জড়িয়ে পড়াকেই 'আদর্শ' মনে করে।

অনেকের মত হচ্ছে, সুস্থধারার ছাত্ররাজনীতি বিকাশের পথকে রুদ্ধ করার কারণেই ক্যাম্পাসে হানাহানি-মারামারি-সন্ত্রাস অপকর্ম ঘটছে। সুস্থধারার ছাত্ররাজনীতি না থাকার কারণেই বুয়েটে আবরার হত্যার মতো ঘটনা ঘটছে। সে ক্ষেত্রে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ নয়, বরং রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি থেকে ছাত্ররাজনীতিকে মুক্ত করতে হবে। ছাত্রদের স্বাধীনভাবে রাজনীতি করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

তা ছাড়া ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করাটা গণতন্ত্রসম্মত কোনো সিদ্ধান্ত নয়। আমরা জানি যে, দেশের বর্তমান সাংবিধানিক আইন অনুসারে ১৮ বছর বয়স হলেই যে কোনো বাংলাদেশি নাগরিক নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার অর্জন করেন। ভোট দেওয়ার অধিকারের পেছনে যে গণতান্ত্রিক যুক্তিটি রয়েছে, তার তাৎপর্য কিন্তু বৈপ্লবিক। যুক্তিটি হলো যে, নির্বাচনী গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিকের মতামতের মূল্য সমান। অর্থাৎ, কলেজের প্রথম বর্ষের যে শিক্ষার্থী সবেমাত্র ভোটাধিকার পেয়েছে, আর যে প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ রোজ রাতে টেলিভিশনে জ্ঞানদান করেন, ভোটদাতা হিসেবে তাদের দুজনের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা কিন্তু সমান বলে গণ্য করতে হবে। কারণ শিক্ষার্থীটির ভোটের মূল্য এক, আর শিক্ষাবিদ, তিনি যত প্রবীণই হোন না কেন, তার ভোটের মূল্যও এক। কিন্তু সনাতন আশ্রমধর্মের সংস্কার আমাদের এমনই মজ্জাগত যে, এই মৌলিক গণতান্ত্রিক সত্যটা আমরা কিছুতেই মানতে চাই না। ছাত্রদের অপরিণত বুদ্ধি, স্বাভাবিক চাপল্য, দূরদৃষ্টির অভাব ইত্যাদি অপ্রাসঙ্গিক বিষয় তুলে আসলে যথার্থ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রসারকেই ঠেকিয়ে রাখতে চাই।

এ ব্যাপারে অনেকেই পশ্চিমের গণতন্ত্রে ছাত্ররাজনীতির কথা টেনে আনেন। একটা চালু ধারণা আছে, ইউরোপ-আমেরিকার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতির সংস্রবে আসতে দেওয়া হয় না। কথাটা একেবারে ভুল। বরং উন্নত দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা যথেষ্ট রাজনীতি করে। তার কারণ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা আর সমাবেশ বা সংগঠন করার অধিকার সেসব দেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অঙ্গাঙ্গি অংশ। ছাত্রদের তা থেকে বঞ্চিত করার প্রশ্নই ওঠে না। বস্তুত সমাজের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সক্রিয়তা অনেকটাই বেশি। সেখানে রীতিমতো ছাত্র আন্দোলন হয়, ছাত্র ধর্মঘট প্রচুর না হলেও মোটেই বিরল নয়। কলেজ চত্বরে দলীয় রাজনীতি যে প্রবেশ করে না, তা-ও নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য নির্বাচনের সময় ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস থেকে ছুটি নিয়ে প্রচার বা দলীয় সংগঠনের কাজে যোগ দিতে চলে যায়। অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনের সমাবেশে যারা যেত, তাদের অধিকাংশই কলেজের ছাত্রছাত্রী। ব্রিটেন কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে দেখা যায় প্যালেস্টাইনে ইসরায়েলি হামলা, ইরাক-আফগানিস্তানের যুদ্ধ কিংবা সমকামীদের বিবাহের অধিকার নিয়ে সভা-সমাবেশ চলেছে। এ শুধু বামপন্থি ছাত্রদের কা-, এমনও নয়। দক্ষিণপন্থি শিক্ষার্থীরাও রীতিমতো সংগঠিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রাজনৈতিক প্রচার করে। সুতরাং পশ্চিমি গণতন্ত্রে ছাত্রজীবন রাজনীতিমুক্ত, এ ধারণা তথ্য হিসেবে ভুল। এমন অবস্থা কাম্য বলেও বিশেষ কেউ মনে করে না।

আসলে যা নিয়ে অনেকেই খুব বিচলিত, তা হলো আমাদের দেশে ছাত্রজীবনে দলীয় রাজনীতির ব্যাপক অনুপ্রবেশ। অবশ্য এরও একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, যা অন্য দেশে নেই। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবী দলগুলোর প্রচার আর সংগঠন থেকে এর শুরু। গোপন সংগঠন থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্য দলীয় ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে। এর ফলে ছাত্র সংগঠনের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে যায়, বাইরের নেতাদের উপদেশে তথা নির্দেশে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা চালিত হতে থাকে। ক্রমে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে নানা দুর্নীতি ও অর্থকরী কার্যক্রমে। যেমন ছাত্র ভর্তি, বিভিন্ন নির্মাণকাজের ঠিকাদারি, হলের ওপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। রাজনৈতিক দলের কাছে তাই ছাত্র সংগঠন দখল করা বা দখলে রাখা জরুরি হয়ে ওঠে। এর ফলে যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দলাদলি, বিশৃঙ্খলা আর হিংসা প্রবলভাবে বেড়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ সমস্যা ছাত্রদের রাজনীতি করার অধিকার নিয়ে সন্দেহ জাগায় না। ছাত্রদের রাজনৈতিক সমাবেশ বা সংগঠন কীভাবে হবে, এ হলো তার নিয়ম নির্ধারণের সমস্যা। সেই নিয়ম নিয়ে নতুন করে ভাবা অবশ্যই জরুরি হয়ে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে জনপ্রিয় প্রস্তাব হচ্ছে, প্রতিটি ছাত্র সংগঠনের স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্বতা বজায় রাখা এবং রাজনৈতিক দল আর বহিরাগত নেতাদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।

এ কথা ঠিক যে, আমাদের দেশে ছাত্ররাজনীতিতে দলীয় রাজনীতির প্রভাব মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এর বাইরে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিও গোপনে ডানা মেলছে। ছাত্ররাজনীতিতে দলীয় প্রভাব কমলে যে অন্য ধরনের ধর্মভিত্তিক সংগঠন এবং আন্দোলন বেড়ে উঠবে না, তা জোর গলায় বলা যায় না। সে রকম রাজনীতির আশঙ্কা বা সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের জ্ঞানী-গুণী-বুদ্ধিজীবীরা বড় বেশি ভাবিত বলে মনে হয় না। ছাত্ররাজনীতির প্রধান লক্ষ্য হতে পারেÑ এক. ছাত্রজীবন-সংক্রান্ত মত, দাবি বা প্রস্তাব তুলে ধরা। দুই. ভবিষ্যতের জন্য ছাত্রদের গণতান্ত্রিক চেতনা গড়ে তোলা। আজ এই মাটিতে দ্বিতীয় লক্ষ্যটি পূরণ করা সবচেয়ে জরুরি নয় কি?

ছাত্ররাজনীতির দলীয় বিকার নিয়ে দেশের মানুষ আজ চিন্তিত। মুশকিল হলো, বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীরা সেই বিকার বেমালুম অস্বীকার করছেন! তাদের ঘোষণা মতো তারা 'আদর্শ রাজনীতি' করছেন। ঠিক পথেই আছেন। এই আত্মঘাতী ভ-ামি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। নিজেদের ইচ্ছাবিলাস চরিতার্থ করার জন্য চরম ও প্রকটভাবে আদর্শহীন একটা ব্যবস্থা অনন্তকাল আঁকড়ে ধরে থাকা সমর্থন করা যায় না। পরিবর্তনটা সবার আগে দরকার জাতীয় রাজনীতিতে। সেটা হলে ছাত্রসমাজের সামাজিক বোধ ও কর্মোদ্যম ফলপ্রসূ করার রাস্তা

ঠিকই বেরিয়ে আসবে। হয়তো একটু সময় লাগবে। কিন্তু আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব আদর্শহীনতাকে আদর্শ মনে করে বিকারের যে চোরা গলিতে দাঁড়িয়ে আছেন, তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টাটা তো করতে হবে।